“কমান্ডো কমান্ডো”

অ্যা জার্নি থ্রু হেল

“কমান্ডো কমান্ডো”

অ্যা জার্নি থ্রু হেল

মাহ্‌মুদ হাসান

অনলাইনে অর্ডার করতে
http://nalonda.com.bd

কলকাতায় পরিবেশক
বইবাংলা
স্টল # ১৭, ব্লক # ২, সূর্য সেন স্ট্রিট
কলেজ স্কোয়ার দক্ষিণ, কলকাতা-৭০০০১২
ফোন : +৯১৭৯০৮০৭১৭৬৫ (কলকাতা)

“কমান্ডো কমান্ডো”	মাহ্‌মুদ হাসান
প্রকাশক	রেদওয়ানুর রহমান জুয়েল নালন্দা ৩৮/৪ বাংলাবাজার (মান্নান মার্কেট) তৃতীয় তলা, ঢাকা-১১০০
স্বত্ব	মাহ্‌মুদ হাসান
প্রচ্ছদ	সজল চৌধুরী
প্রথম প্রকাশ	ফেব্রুয়ারি ২০২৫
মুদ্রণ	শামীম প্রিন্টিং প্রেস
বর্ণবিন্যাস	নালন্দা কম্পিউটার বিভাগ
মূল্য	
যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক	মুক্তধারা জ্যাকসন হাইট নিউ ইয়র্ক

©	Mahmud Hasan
Commando Commando	Mahmud Hasan
Cover Design	Sazal Chowdhury
First Pubished	February 2025
Publisher	Radawanur Rahman Jewel Nalonda 38/4 Banglabazar (Mannan Market) 2nd Floor, Dhaka-1100
Price	
ISBN	978-984-99344-1-7
E-mail	nalonda71@gmail.co

উৎসর্গ

সমস্ত প্রশংসা যার সেই মহান আল্লাহ তায়ালাকে–
আমাদের জীবনে যা কিছু অর্জন সব তারই অনুগ্রহ।

মুখবন্ধ

“কমান্ডো” শব্দটি আমার কাছে একটি রোমাঞ্চকর অনুভূতির নাম। কিশোর বয়সে পড়া মেজর আনোয়ার হোসেনের “হেল কমান্ডো” বইটি ছিল আমার এই শব্দটির একনিষ্ঠ ভক্ত হওয়ার প্রথম কারণ। বইটি রচিত হয়েছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর স্পেশাল ফোর্সের কঠোর প্রশিক্ষণের কাহিনির উপর ভিত্তি করে। অনেকদিন পর্যন্ত এটিই ছিল বাংলায় লেখা কমান্ডো কোর্সের উপর একমাত্র বই। পরবর্তীতে রোমাঞ্চকর এই “কমান্ডো” জীবন সম্পর্কে আরও জানতে পেরেছি মার্ক ওয়েনের “নো ইজি ডে”, জেস ইটজলারের “লিভিং উইথ অ্যা সিল” এবং ডেভিড গগিন্সের “ক্যান্ট হার্ট মি” নামক তিনটি বিদেশি বই থেকে। এই বইগুলো আমার সামনে মেলে ধরেছে দুর্দান্ত চ্যালেঞ্জিং কমান্ডো জীবনের প্রতিটি বাঁক।

আমি ছিলাম বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রথম কমান্ডো কোর্স নেভাল কমান্ডো বেসিক-১ (এনসিবি-১)-এর সদস্য। এই কোর্স শেষ হয়েছে ২০০৯ সালের নভেম্বর মাসে। এই কোর্সের অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি বই লেখার জন্য নিজের ভিতর থেকে একটা তাগিদ অনুভব করছিলাম অনেকদিন যাবৎ। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশোনা এবং চাকরির ব্যস্ততায় লেখার কাজটি শুরুই করতে পারিনি দীর্ঘদিন।

একদিন ফেইসবুকে দেখলাম ভাতিজি ফাতিহা আয়াত একটা ছবি পোস্ট করে আমাকে ট্যাগ করেছে। ছবিতে ছোট্ট ফাতিহা অবস্ট্যাকল গ্র্যাউন্ডে মাংকি ব্রিজ পার হওয়ার চেষ্টা করছে– সেখানে সে ইন্সপায়ারেশন হিসেবে চাচ্চুর নাম উল্লেখ করেছে। ব্যাপারটা আমাকে আনন্দিত এবং একইসাথে গভীরভাবে প্রভাবিত করল। এসব ব্যাপারে তাহলে আজকাল শিশুরাও অনুপ্রাণিত হয়! এই বইটি লেখার ব্যাপারে তার এই ছোট্ট পোস্টটা ট্রিগারিং ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করেছে। ডিটারমাইন্ড হলাম– বইটা আমাকে লিখতেই হবে। স্বপ্ন বাস্তবায়নের সামনে হার্ডলস রইল একটাই, তা হলো “সময়”। অবশেষে ফুসরত মিলল স্টাফকোর্স এবং এমটেক শেষ করার পর। নিজের পারিবারিক, পেশাগত ও সামাজিক ব্যস্ততার পাশ কাটিয়ে লেখার জন্য সময় বের করা ছিল সত্যিই কঠিন।

বইটির কাহিনি আবর্তিত হয়েছে কোর্স পরবর্তী জীবনের বাঁকে বাঁকে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কমান্ডো কোর্স থেকে অর্জিত শিক্ষার উপযুক্ত প্রয়োগ এবং সেই সময়ের স্মৃতিচারণকে ঘিরে। এই স্মৃতিচারণ আমাকে বারবার ফিরিয়ে নিয়ে গেছে জীবনের চ্যালেঞ্জিং আর রোমাঞ্চকর সেসব দিনগুলোতে। প্রায় ১৪ বছর আগে সম্পন্ন করা কোর্স নিয়ে লিখতে হয়েছে সম্পূর্ণ স্মৃতির উপর ভর করে। এই বইতে উল্লিখিত সকল কাহিনি বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে নেওয়া সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা। তবে যেহেতু প্রায় এক যুগেরও বেশি সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর স্মৃতি রোমন্থন করা হয়েছে, সেহেতু কিছুটা ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা থেকেই যায়।

বইটিতে সকল চরিত্রের সত্যিকার নাম ব্যবহার করতে পারলে খুবই ভালো হতো বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি। তবে কমান্ডোদের তথা সামরিক বাহিনীর সদস্যদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারটিই আমার কাছে সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে বিধায় আবেগকে প্রশ্রয় না দিয়ে এই বইতে ইচ্ছাকৃতভাবে সকল চরিত্রের ছদ্মনাম ব্যবহার করা হয়েছে। বইটিতে পরিস্থিতির দাবিতে অনেক জায়গায় ইচ্ছাকৃতভাবেই ইংরেজি শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। এই লেখায় ভাষাগত মাধুর্যের কমতি রয়েছে বলে স্বীকার করে নিচ্ছি, আশা করি লেখক সাহিত্য জগতের নিয়মিত মুখ না হওয়ায় পাঠক তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

এই বইটির প্রাথমিক খসড়া তৈরির পর আমি সামরিক এবং বেসামরিক পরিমণ্ডলে অনেকের পরামর্শ গ্রহণ করেছি যাদের মধ্যে রয়েছেন– আমার জ্যেষ্ঠ, সমসাময়িক এবং কনিষ্ঠ সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, স্বনামধন্য লেখক, চিকিৎসক এবং আইনজীবী। এই তালিকাটি অনেক লম্বা বিধায় তাদের নাম এখানে উল্লেখ না করে বইয়ের শেষে ‘কৃতজ্ঞতা স্বীকার’ অংশে উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের আন্তরিক সহযোগিতা ব্যতীত আমার একার পক্ষে এই বইটি রচনা করা সম্ভব হতো না বলে আমি মনে করি।

এই বইতে ক্লাসিফাইড কোনো তথ্য প্রদান করা হয়নি। বইতে উল্লিখিত অনুসিদ্ধান্ত বা মতামতসমূহ সম্পূর্ণই আমার নিজস্ব এবং তার যাবতীয় দায়ভার আমার উপর বর্তায়। তারপরও কোনো অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয় কারও দৃষ্টিগোচর হলে তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা এবং পরবর্তী প্রকাশে পরিমার্জনের জন্য লেখককে জানানোর অনুরোধ রইল।

একটি কথা বিনীতভাবে জানাতে চাই– এই গল্পটি আমার নয়, গল্পটি আমাদের সকল নৌবাহিনী কমান্ডোর। এই গল্পের নায়ক আমি নই, বরং এনসিবি কোর্স সফলভাবে সম্পন্ন করা কিংবা মাঝপথে ঝরে যাওয়া সকল কমান্ডোই এই গল্পের সত্যিকারের নায়ক। এনসিবি কোর্সে যারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে, যারা প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে, যারা সাপোর্ট প্রদান করেছে, যারা পরিকল্পনা করেছে– এই গল্প তাদের সকলের।

এই গল্পটি মনস্তাত্ত্বিক বাধাকে অতিক্রম করে সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত উন্মোচনের গল্প, নিজেকে চ্যালেঞ্জ করে নিজের সীমাবদ্ধতাকে প্রতিনিয়ত আরেকটু সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার গল্প। বিপৎসংকুল এবং রোমাঞ্চকর এই স্বপ্নযাত্রার সারথি হিসেবে পাঠককে লেখকের সাথে একই বাহনে আরোহণ করানোই এই লেখার সত্যিকারের উদ্দেশ্য।

মাহ্‌মুদ হাসান
সেন্ট মার্টিন্স দ্বীপ
২১ ডিসেম্বর ২০২৪

সূচিপত্র

"কমান্ডো"-ই কেন হতে হলো আমাকে # ১১
"কমান্ডো" শব্দটির সাথে প্রথম পরিচয় # ১৫
হাস্যকর প্রাক-প্রস্তুতি এবং বাস্তবতা # ২১
কোর্সের প্রারম্ভিক দিনগুলো– সে আসে ধীর লয়ে # ২৭
স্বেচ্ছা বিদায়ের ঘোষণা এবং অতঃপর # ৩৫
টারজানের 'হাই' এবং কমান্ডো পিটি # ৪২
দৌড়, দৌড়, দৌড় এবং অন্যান্য # ৪৮
ফিন্স-মাস্ক পরে মৎস্য বেশে সাঁতারের ম্যারাথন # ৫৫
ইনস্ট্রাক্টর–স্টাফ কথন # ৬০
স্ট্যান্ডার্ড-নো কমপ্রোমাইজ # ৬৪
হেলউইক : ঘুম এবং বিশ্রামকে দিলাম ছুটি # ৭১
ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত পায়ে এগিয়ে চলা # ৮০
হেলউইকের অন্তিম পর্ব : মনোবলই যেথায় সাথি # ৮৭
হারার আগেই হেরে না যাওয়ার প্রত্যয় # ৯৬
বয়েল'স, চার্লস আর ডাল্টনের থিয়োরির ব্যাবহারিক প্রয়োগ # ১০২
ক্লাসিক্যাল ডুবুরি প্রশিক্ষণ # ১০৭
হাত-পা বাঁধা সাঁতার # ১১২
ডাইভিং ফিজিক্স # ১১৮
জাহাজের তলদেশে ডুব এবং খরস্রোতা কর্ণফুলি রিভার ক্রসিং # ১২৩
ডেমোলিশন # ১২৮
কমান্ডো লেগ : ফিটনেসের চূড়ান্ত শিখর # ১৩২
ডিপ ডাইভিং: নিকষ কালো আঁধারের ভয়ংকর শীতল # ১৪১
স্পিড মার্চ : না দৌড় না হাঁটা # ১৪৮
শেষ হইয়াও হইল না শেষ : কত কাছে, তবুও কত দূর # ১৫৪
জঙ্গল লেইন শুটিং এবং ভূতের কিল # ১৫৯
নির্ঘুম রাতে সুর যন্ত্রণা এবং মেন্টাল ব্রেকডাউন # ১৬৫
কম্পাস মার্চ # ১৬৮
কমান্ডো ট্যাকটিকস : রেইড, অ্যাম্বুশ এবং হাইড আউট # ১৭২
ফাইনাল এক্সারসাইজ : কাপ্তাই থেকে চট্টগ্রাম পদব্রজে যাত্রা # ১৭৯
গ্র্যাজুয়েশন # ১৮৮
কোর্স পরবর্তী ক্রেইজি কর্মকান্ড # ১৯২
এক্সপ্লোসিভ অর্ডন্যান্স ডিসপোজাল কোর্স # ১৯৬
আত্মোপলব্ধি # ২০০
নির্ঘণ্ট # ২০৩
কৃতজ্ঞতা স্বীকার # ২০৫

"কমান্ডো"-ই কেন হতে হলো আমাকে

ভারতের স্পিতি ভ্যালির এক হোমস্টের ছাদে হ্যামকে ঝুলছি আমরা পিতা-কন্যারা। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সাড়ে বারো হাজার ফুট উপরের এই স্থানটাকে বলা হয় শীতল মরুভূমি বা কোল্ড ডেজার্ট। আশেপাশে রুক্ষ প্রাণহীন সব পাহাড়, তাদের অলংকৃত করে রেখেছে শ্বেত-শুভ্র বরফের আস্তরণ। চাঁদের আলোয় চকচক করছে সফেদ পর্বতশৃঙ্গসমূহ। চাঁদটাও অনেক কাছে লাগছে, মনে হয় হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে। রাতের পরিষ্কার আকাশে তারাগুলো ঝিকিমিকি করছে। এমন অপার্থিব রাতে মোবাইল ফোন স্বভাবতই দূরে রেখেছি। প্রকৃতির এমন সান্নিধ্য, তারাদের সাথে কথা বলার এই সুযোগ আবার কবে মিলবে কে জানে।

তবে কন্যারা তো এত গভীর জীবনবোধ বোঝার মতো বয়সে এখনও উপনীত হয়নি। তাই অনুমিতভাবে সহজ বিনোদন হিসেবে সুযোগ বুঝে তারা তাদের বাবার মোবাইলের দখল নিয়ে নিল। কন্যারা মোবাইলে পুরাতন ছবি দেখছে, হঠাৎ গুগল ফুটেজের একটা ছবিতে তাদের চোখ আটকে গেল। একটা দগদগে ঘা-যুক্ত রক্তাক্ত বীভৎস পায়ের ছবি! তারা ছবি দেখেই আঁতকে উঠল। জিজ্ঞেস করল– "বাবা, এটা কার পা?" এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে মানসপটে জাগ্রত হলো এক যুগেরও আগের এক স্মৃতি, যে স্মৃতি কখনো ভোলার নয়। খুলে গেল স্মৃতির ঝাঁপি, বিমুগ্ধ শ্রোতা আমার স্ত্রী-কন্যারা, আর বরফঢাকা শ্বেত-শুভ্র পর্বতচূড়া।

২০০৯ সালের জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহ। ছয়দিনের ভেজা বুটের মধ্যে জমে থাকা পানিতে পচে যাওয়া পা নিয়ে পড়ে আছি কাপ্তাই নৌবাহিনী ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের রাস্তার পাশে। নৌবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং শাখার অফিসার ও নাবিকদের ব্যস্ততামুখর সময় কাটছে সেখানে, তবে সবাই ক্লাসরুমে বা

ল্যাবে, রাস্তায় বা বারান্দায় লোক সমাবেশ নেই বললেই চলে। পায়ের বুট খুলেছি কিছুক্ষণ আগে, এর চেয়ে না খোলাই মনে হয় ভালো হতো। মোজা খোলার সাথে সাথে নরম হয়ে যাওয়া সাদা চামড়াগুলো উঠে এসেছে। নখও উঠে গেছে একটা। দুপায়ের অজস্র ক্ষত দিয়ে অঝোরে রক্ত পড়ছে, ঠিক যেন জলরঙে লাল রঙের শেড দেওয়ার মতো ব্যাপার। মাছি বসছে কিছুক্ষণ পরপর সেখানে। আমার অতি দুরবস্থা দেখে পা শুকানোর জন্য আমাকে রোদের মধ্যে ফেলে রেখে বাকি কমান্ডোরা পরবর্তী ইভেন্টের জন্য চলে গেছে অনেক দূরে, এক ঘণ্টা পর তাদের ফিরে আসার কথা।

ছয়দিন যাবৎ নিদ্রাহীন, বিশ্রামহীন শরীরটা যেন ছেড়ে দিয়েছে। সারা শরীরে ব্যথা, মনে হচ্ছে গায়ে তুলা দিয়ে স্পর্শ করলেও ব্যথা লাগবে, এই ব্যথায় ঘুমানো সম্ভব না। শরীরে কোনো শক্তিই আর অবশিষ্ট নেই, নেই পায়ে হেঁটে চলার ক্ষমতাও। এই পা কতদিনে ঠিক হবে, কিংবা আদৌ কখনো ঠিক হবে কি না তাও জানা নেই, কোর্স সফলভাবে শেষ করা তো অনেক দূরের ব্যাপার।

কাঁধে র‍্যাংকের ফ্ল্যাপ আছে, তবে র‍্যাংক নেই, কোর্সের প্রয়োজনে খুলে ফেলতে হয়েছে। রাস্তা দিয়ে মাঝেমধ্যে আসা-যাওয়া করা নাবিকরা উৎসুক দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে, ঠিক বুঝতে পারছে না আমার পরিচয়। অফিসার তো দূরে থাক, একজন নবীন নাবিকেরও রাস্তায় এভাবে পড়ে থাকার কথা না। সময় যেন থেমে গেছে, গাছের পাতাও যেন নড়ছে না। হঠাৎ করে পাওয়া এই এক ঘণ্টা বিরতি যেন অফুরন্ত সময়। ঘড়ির কাঁটা যেন ঘুরছেই না, মিনিটগুলো যেন ঘণ্টার মতো মনে হতে লাগল। আমি ডুবে গেলাম গভীর চিন্তার জগতে।

"কেন আমি এখানে? কমান্ডো হওয়া কি আমার জন্য খুবই জরুরি? কেন আমি এই অবস্থায় পড়ে আছি?" কোর্সের বিভিন্ন কঠিন সময়ে বারবার এসব প্রশ্ন মনে জাগরিত হয়। একবার তো এই প্রশ্নগুলোর উত্তর মেলাতে না পেরে নট উইলিংই করে বসেছিলাম। তবে বড়সড়ো ক্ষতির আগেই আবার ফিরে এসেছি। এবার এই উত্তর আমাকে বের করতেই হবে।

আমাকে এখনই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আমি কি শেষ পর্যন্ত কমান্ডো হতে চাই, নাকি ভাগ্যকে মেনে নিয়ে পরাজিত সৈনিকের মতো ইউনিটে ফিরে যেতে চাই। বিশ্ববিদ্যালয় জীবন, নয়টা-পাঁচটা অফিস জীবন– এসব তো দেখা হয়েছে অনেক। এখন সময় হয়েছে জীবনের অন্য দিকগুলো দেখার– সারাদিন মাঠে পড়ে থাকতে কেমন লাগে, বোমা ডিসপোজ অফ করতে কেমন লাগে, স্পেশাল ফোর্স– যাদের নিয়ে এত সিনেমা হয় তাদের সাথে কাজ করতে কেমন লাগে, পানির তলদেশের রহস্যময় জগৎটা কেমন, দিনের পর দিন জঙ্গলে না খেয়ে, না ঘুমিয়ে থাকতে কেমন লাগে– এসব জানার সুযোগ তো আমার এটাই।

দূরে কমান্ডো দলের “কমান্ডো কমান্ডো” শোরগোল আমাকে ভাবনার জগৎ থেকে বাস্তবে ফেরত নিয়ে এলো। পায়ের কথা চিন্তা করে লাভ নেই, কোর্সে টিকে থাকার জন্য এটাই শেষ সুযোগ। এখন চলে গেলে পায়ের ক্ষত হয়তো দ্রুত শুকাবে, কিন্তু মনের ক্ষত– সেটা তো সময়ের সাথে সাথে বাড়বে বই কমবে না। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ আমি, চোয়াল শক্ত করে দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা সহ্য করে বুটে আবার সেই পচে যাওয়া পা ঢুকালাম। হ্যাঁ, আমি কমান্ডোই হতে চাই, এতে পা থাকুক আর না থাকুক। একবার যখন কোর্সে এসেই গিয়েছি স্বেচ্ছায়, এর শেষ দেখাটাও আমার চাই।

আমি জানি যে বেশিরভাগ যুদ্ধেরই হারজিত নির্ধারিত হয়ে যায় আমাদের মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে। ক্ষণিকের আরামের লোভে আমার মন যেন আমার সত্তাকে পরাজিত করে ফেলতে না পারে সেটাই এখন নিশ্চিত করতে হবে। পরাজিত সৈনিকের গ্লানি নিয়ে আরাম করার চেয়ে কষ্ট সহ্য করে বিজয়ীর বেশে ফেরাই আমার জন্য বেশি কাম্য। গল্পের এ পর্যায়ে কন্যাদের মা পাশ থেকে প্রশ্ন করল– “আচ্ছা, এই পৃথিবীতে এতকিছু থাকতে তোমাকে কমান্ডোই কেন হতে হলো?” এই অবধারিত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে স্মৃতির মানসপটে ফিরে গেলাম ২০০৯ সালে।

“২০০৯ সাল। মধ্য এপ্রিলের এক নিশুতি রাত। লোকালয় ছেড়ে বহুদূরে এই জায়গাটিতে হিমেল হাওয়ায় শরীর-মন জুড়িয়ে যায়। চারদিক কোথাও কোনো কৃত্রিম আলো নেই। তবে তাতে কিছু আসে যায় না, আলোর কোনো অভাব নেই আসলে। আকাশে মস্তবড় এক চাঁদ। চাঁদের আলো সমুদ্রের পানিতে প্রতিফলিত হচ্ছে। বড় বড় ঢেউ এসে পানিতে থাকা চাঁদের প্রতিবিম্বকে বারবার ভেঙে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। তবে তা একান্তই সাময়িক, একটু পরই তা আবার আগের জায়গায় ফিরে আসছে। এ যেন জোছনার সাথে সমুদ্রের নোনা জলের এক নির্দোষ খেলা, হারজিতের কোনো বালাই নেই।

মাঝসমুদ্রে দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সর্বাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্রবাহী রণতরি বানৌজা বঙ্গবন্ধু, এটি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ফ্ল্যাগশিপ, গৌরবের প্রতীক। জাহাজের ফক্সলে বসে আছে ২২-২৩ বছর বয়সি কয়েকজন তরুণ প্রশিক্ষণার্থী অফিসার। সারাদিনের কর্মব্যস্ততা আর প্রচণ্ড ধকল শেষে পাইপডাউনের পর একটুখানি অবসর পেলেই গভীর জীবনবোধ নিয়ে আলোচনায় বসে তারা। কী নেই সেই আলোচনায়– প্রথম প্রেমের গল্প, কলেজ জীবনের গল্প, ক্রিকেট মাঠের গল্প, বইমেলায় একনজর দেখা সুন্দরী রমণীর গল্প, জীবনের বিভিন্ন প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির গল্প। দূর থেকে আকাশের চাঁদ-তারা মিটমিট করে তাদের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকে। যদিও তারা জানে না মাটির পৃথিবীতে সমুদ্রের মাঝে জাহাজের ফক্সলে বসে তরুণরা কী নিয়ে আলোচনা করছে। সেই তরুণদের মধ্যে একজন আমি।

আমাদের দিন ভালোই কাটছিল এমআইএসটিতে। সেখানে আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং-এ গ্র্যাজুয়েশন করছিলাম। মাঝে এক বছরের জন্য আমাদের শিক্ষাক্রম স্থগিত ছিল। এসময়ে আমার ঠিকানা হলো বিএনএস বঙ্গবন্ধু। প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের এখানে বেশ ব্যস্ত সময় কাটে, দম ফেলার যেন কোনো ফুসরত নেই। আড্ডায় সবার চেহারায় কেমন যেন অমাবস্যার ছাপ। হঠাৎ আবিদের মুখে জ্বলে উঠল পাঁচশ ওয়াটের বাল্বের আলো। আমার উদ্দেশ্যে বলল, “বন্ধু, কমান্ডো কোর্স করবি?” বলে কী সে, শুনে হেসেই উড়িয়ে দিলাম। “আমাকে কোন অ্যাংগেলে কমান্ডো মানসিকতার বলে মনে হয় তোর? ছয় বছরের ক্যাডেট কলেজ জীবনে কোনোদিন দেখেছিস আমাকে এসব ব্যাপারে উৎসাহ দেখাতে?” বললাম আবিদকে।

সে নাছোড়বান্দা– “তুই তো দৌড়ে ভালো, আমরা নেভাল একাডেমিতে তা দেখেছি, তোর হবে, নাম দে তুই।” আমি আবারও পিছুটান দেওয়ার চেষ্টা করলাম, বললাম, “সাঁতারই তো পারি না ঠিকমতো, দুই দিন পরই বের করে দেবে কোর্স থেকে।” আবিদ তখন তার অকাট্য যুক্তি দিল– “দেখ, আমাদের কমফোর্ট জোন ছিল এমআইএসটির ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশোনা। সেখান থেকে যেহেতু বের হয়ে এসে কষ্টের জীবনে ঢুকতে বাধ্যই হয়েছি, তাহলে এই সময়টার সর্বোত্তম ব্যবহার কেন করব না।” আমাদের বয়স, ব্যস্ততা, পড়াশোনার বিরতি, কমান্ডো কোর্সের ব্যাপ্তি এসব বিবেচনায় এটিই হতে পারে এই সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহার– তার যুক্তি মেনে নিতে বাধ্য হলাম।

"কমান্ডো" শব্দটির সাথে প্রথম পরিচয়

সময়টা ২০০৪ সাল। বরিশাল ক্যাডেট কলেজের ছুটির দিনের এক অলস দুপুর। পাখি ডাকে না, গাছের পাতাও নড়ে না। গ্রীষ্মের দাবদাহে প্রকৃতিও যেন ক্লান্ত। গরমে অতিষ্ঠ ক্যাডেটরাও মরার মতো ঘুমাচ্ছে, সৃষ্টিশীলতা বা দুষ্টামি, কোনোটাই যেন এই গরমে ঠিক আসে না। সপ্তাহে একটা দিন মাত্র ছুটি পাওয়া যায়, এই গরমে ঘুমই তাই সর্বোৎকৃষ্ট বিনোদন।

তিনতলায় সোহরাওয়ার্দী হাউস, আলো-বাতাস বেশ ভালো। একটা গল্পের বই হাতে নিয়ে খাটে শরীরটা এলিয়ে দিয়েছি। মাঝেমধ্যে দৃষ্টি চলে যাচ্ছে জানালার পাশের পুকুরে। পুকুর পাড়ের সারিবদ্ধ নারকেল গাছগুলো যেন কালের সাক্ষী। প্রতি বছর ক্লাস সেভেনে ক্যাডেট আসে, বড় হয়, ছয় বছর কাটিয়ে চলে যায় কলেজ প্রাঙ্গণ ছেড়ে, নতুন ক্যাডেট তার শূন্যস্থান পূরণ করে। সবাই চলে যায়, রয়ে যায় কালের সাক্ষী এই নারকেল গাছগুলো।

এই গরমের মধ্যেও নিচতলার শরিয়তুল্লাহ হাউজের চঞ্চলমতি বন্ধু শহীদ লাফাতে লাফাতে তিনতলা সিঁড়ি বেয়ে আমার রুমে এসে হাজির। নিচতলায় গরম কম হওয়ায় বন্ধু এখনও সজীব আছে তাহলে! তার হাতে নীল রঙের একটা বই। বইটির নাম দেখে একটু অবাক হলাম– "হেল কমান্ডো"! ততদিনে আমি সেবা প্রকাশনী, তিন গোয়েন্দা, মাসুদ রানা, ওয়েস্টার্ন, জাফর ইকবাল, হুমায়ূন আহমেদ পাঠ শেষ করে শীর্ষেন্দু, সুনীল, সমরেশের মোটা মোটা ডিকশনারিসম বইয়ের একনিষ্ঠ পাঠক।

পাঠক হিসেবে উপরে ওঠার এই সিঁড়িটা আমার কাজিন বিশিষ্ট বিতার্কিক আফতাব ভাইয়ের আবিষ্কার। এই সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে হবে, নিচে নামা যাবে না কোনোভাবেই, তাহলে মান-ইজ্জত চলে যেতে পারে। তাই এই ছোট আকৃতির বই পড়তে মন সায় দিচ্ছিল না, কী শিশুতোষ চিন্তাভাবনা!

পড়া শুরু করলাম বইটি, যতই পৃষ্ঠা উলটাই ততই কাহিনির গভীরতায় ডুবে যেতে থাকি। গোগ্রাসে গিলতে থাকি রোমাঞ্চকর রোমহর্ষক এক জীবনকথা। একসময় মনে হলো এই কাহিনির নায়ক সিম্পলি "ফ্রিক", এই কাজ সাধারণ মানুষের না। এরকম পরিবেশে মানুষ থাকে কীভাবে? একদিন, দুদিনের ব্যাপার না, দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস! বইয়ের কাহিনি ধরে এগোতে থাকি। পড়ি আর অন্যরকম শিহরনে ডুবে যাই, তবে কখনোই নিজেকে দূরতম কল্পনায়ও গল্পের নায়কের আসনে বসানোর সাহস করি না।

আমি ছিলাম নিতান্তই অলস প্রজাতির এক ক্যাডেট, শারীরিক পরিশ্রমকে সব সময়ই এড়িয়ে এসেছি সচেতনভাবে। অল্পবিস্তর পড়াশোনা আর অধিকতর দুষ্টামি করেই পার করে দিয়েছি ক্যাডেট কলেজের দিনগুলো। ক্যাডেট কলেজের প্রথম পিটির দিনেই সম্পূর্ণ কলেজ এরিয়াতে যখন ৬টি চক্কর (প্রায় ৫ কিলো) দিতে হলো, তখনই পিটি শেষে রুমে গিয়ে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ৬ বছরে কয়টা চক্কর দিতে হবে তার গাণিতিক হিসাব কষে ফেলেছিলাম। ক্যালকুলেটরের আউটপুট দেখে তো আমার চক্ষু চড়কগাছ, প্রায় পাঁচ হাজার কিলোমিটার! সামরিক বাহিনীতে যোগদানের ইচ্ছার সেখানেই ইতি।

আমার এক বন্ধুর দুলাভাই সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন, সেই সুবাদে সে সেনাবাহিনী সম্পর্কে অনেক কিছু জানত। একদিন "ফ্রগম্যান" শব্দটি উচ্চারণ করে সে সবার মাঝে আলাদাভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ফেলল। তার থেকে জানতে পারলাম যে, সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা নৌবাহিনীতে এসে তিন সপ্তাহের একটা ডুবুরি কোর্স করে, এর নাম ফ্রগম্যান কোর্স।

তার কাছ থেকে আরও জানতে পারলাম যে এর চেয়েও অনেক বেশি কঠিন হলো কমান্ডো কোর্স। সেনাবাহিনী কমান্ডো নাকি ছয় মাসের কোর্স! তবে, তার চেয়েও নাকি কঠিন কমান্ডো কোর্স আছে, সেটা নৌবাহিনীর "সিল" কোর্স। সিল তো একটা সামুদ্রিক প্রাণি, এই কোর্স করতে গেলে কি পানির নিচেই থাকতে হয় ছয় মাস! আমার কল্পনায় সারা গায়ে মাগুর মাছের মতো পিচ্ছিল শ্যাওলাযুক্ত একজন মানুষরূপী সিল ঘুরতে থাকল।

নিজের জন্য একটা আটপৌরে জীবনই চেয়েছিলাম সবসময়। প্রতিদিন সকালে আমি যা যা করতে চাই না তার মধ্যে সবসময় এক নম্বরে থাকে দৌড় বা পিটি। সে কারণেই সামরিক বাহিনীতে যোগদানে অনীহা ছিল বরাবর। দশম শ্রেণিতে থাকতে হুমায়ূন আহমেদের একটা বই পড়েছিলাম, "তেঁতুল বনে জোছনা"। সেখানে মূল চরিত্র সাইকেল ডাক্তার আনিস। তার বউ-নবনী। ভবিষ্যতে আমি আনিস ডাক্তার হব, জনসেবা করব, মানুষ ভালোবাসবে আর নবনীর মতো বউ থাকবে– এইটুকুই ছিল জীবনের কাছে আমার চাওয়া।

কিন্তু বিধাতার হিসাব ছিল একটু অন্যরকম। এই স্বপ্নালু ভবিষ্যৎ আনিস ডাক্তারই যে গল্পটা পড়ার ৪ বছরের মাথায় নৌবাহিনীতে যোগদান করবে, ৭